অথবা এক বদলে যাওয়া লাটাগুড়ির গল্প

সেই জনপদ...

হিমালয়ের পায়ের কাছে শাল, শিমুল, তমাল, গামার চাপ, টুন, বেত আর বাঁশ বনে ঘেরা ছোট্ট সেই জনপদ। উনিশ শতকেও সে ছিল ভুটানরাজের অধীনে। শুধু এই জায়গা কেন, তিস্তা নদীর পূর্বপারের আলিপুর থেকে শুরু করে লাভা, রিশপ, কালিম্পং সবই ছিল ভুটানরাজের সম্পত্তি। রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। পায়ে হাঁটা, জঙ্গলে পরিপূর্ণ সব পথ। দিনের বেলাতেই হাতি লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাত্তিরে তো কথাই নেই! ঘরের পাশের বাঁশবনে খচরমচর আওয়াজ মানেই হাতিতে পেট ভরাচ্ছে। গণ্ডার কিংবা গউর— মানে দিশি বাইসন— হরহামেশা টহল দিয়ে যায় পাড়ার মধ্যে। আ-এ অজগরের মতো তেড়ে না এলেও ভাঙা রাস্তার এধার থেকে ওধার জুড়ে দিব্যি শুয়ে থাকে ময়াল সাপ। বিকেল হতে না হতেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে সেই জনপদে।

বিরাট বিরাট গাছের কাণ্ড (আস্ত বা কেটে ফেলা) হল 'গুঁড়ি', আর যেহেতু এই এলাকা বেত, বাঁশ, লতাগুল্ম ভরা ছিল তাই দুয়ে মিলে এর নাম হয়ে ওঠে 'লতাগুড়ি'। পুরোনো বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্রে 'লতাগুড়ি' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। লতা-গুড়ি শব্দটি ইংরেজিতে *Lataguri* হিসাবে লিখতে হয়— যা ইংরেজিতে উচ্চারণ করতে করতে 'লাটাগুড়ি' শব্দটি চলে আসে। আরেকটি মতও কিন্তু রয়েছে। রাজবংশী ভাষায় 'লাঠা' মানেই মোটা গাছের গুঁড়ি। এক্ষেত্রে লাটা-গুড়ির 'গুড়ি' কিন্তু গাছের গুঁড়ি অর্থে নয়, উত্তরবঙ্গে অরণ্যের গা ঘেঁষে পত্তন হওয়া অনেক জনপদের নামের শেষে 'গুড়ি'-র ব্যবহার আছে (জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, শিলিগুড়ি)।

পুজোপার্বণে

বন্ধু বিপ্লব পালচৌধুরী 'পালচৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজা' নিয়ে লিখতে গিয়ে আমাদের স্মৃতিকে উস্কে দিয়েছেন। যে কোনও বাড়ির দুর্গাপুজা সেই বাড়ির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সম্মান বহন করে। অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় সম্মানীয় নিত্যগোপাল পালচৌধুরী মশাই সেই সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্মান আপন কাজের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। দিন যায়, কথা থাকে। তিনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু রেখে গিয়েছেন তার ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি, যা তাঁর সন্তানসন্ততিরা এই সত্তর বছর ধরে আজও বহন করে চলেছেন।

এই পরিবারের সকলের সাথে আমার পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। গর্ব হত ভেবে তদানীন্তনকালে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম স্থানাধীকারী দেবব্রত পালচৌধুরীর সহপাঠী ছিলাম। এছাড়া শঙ্কর, স্বপন, ওদের ছোটবোন দেবী— আমরা সবাই একই নাট্যগোষ্ঠীর সহকর্মী ছিলাম। দুর্গাপুজোর একদিন তাঁদের বাড়িতে যেতাম। না, ঠাকুর দেখতে নয়। যে সব দাদা-বৌদিরা বাইরে থাকতেন তাঁরা সবাই পুজোর সময় এখানে আসতেন, সবার সাথে দেখা হত, এটাই ছিল আসল কারণ। বড়ো ও মেজো জামাইবাবু ছিলেন প্রায় বন্ধুর মতো। তাস (ব্রীজ) খেলায় ছিল তাঁদের প্রচণ্ড উৎসাহ। খুব সম্ভবত দু'বার সারারাতব্যাপী ব্রিজ প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ও বাড়িতে গেলেই বড়ো গোল করে সিঁদুরপরা বৌদিরা একমুখ হাসি নিয়ে বলত, "কখন এলে? বসো।" আজকাল আর যাই না। দুর্গাপ্রতিমার মতো হাসিমাখা সিঁদুররঞ্জিত কপালগুলো সাদা হয়ে যাওয়ায়, আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

স্বপ্নের আগের স্টেশন

ভরা ট্যুরিস্ট মরশুম। লাটাগুড়ির রঙিন ভিড় পিছনে ফেলে কেন জানি না আজকাল প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি স্টেশনের রাস্তায়। আসার পথে দেখি অনেক স্থায়ী পসারিরা উঠে গিয়েছে, যারা এখনও আশায় আছে তারাও ডেরাডান্ডা গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। সে এক দিন ছিল— যখন মিটার-গেজের ট্রেন পূর্ব পাকিস্তানের লালমনিরহাট, পাটগ্রাম হয়ে বুড়িমারি-চ্যাংড়াবান্ধা পেরিয়ে, ধরলা নদীর ব্রিজের ওপর দিয়ে এসে মালবাজার থেকে, দোমোহনী, ময়নাগুড়ি হয়ে লাটাগুড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়াত— তখন লাটাগুড়ি স্টেশনের দু'ধার জুড়ে ছিল দোকান আর দোকান। ট্রেন ঢুকলেই যেন এক জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে গমগম করে উঠত পুরো এলাকা। ওপার থেকে উজিয়ে আসা টিম্বার মার্চেন্টদের ব্যবসায়ী তত্ত্বতালাশ আর কারও বাড়িতে আসা সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের সওদাগণ্ডা শুরু হয়ে যেত কোনও ভূমিকা ছাড়াই। সে এক হইহই ব্যাপার! ট্রেন বেরিয়ে গেলে ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ত স্টেশনের দু'পাশ। আবার পরের ট্রেনের অপেক্ষা।

বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছি এই ট্রেন আবার চালু হলে ভারত-বাংলাদেশ পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে, সেদিন লাটাগুড়ি উপচে পড়বে বাংলাদেশি ট্যুরিস্টের ভিড়ে। ধরলা ব্রিজ পেরিয়ে সেই ট্রেনে চড়ে কি গফুর, বসিরুলরাও ফেরত আসবে আমার শৈশবের অর্ধেকটা নিয়ে?